Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের বিকাশের গতিপথে, প্রচলিত নাগরিক সমাজকে নিজেদের সাংঘিক সমাজের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবে। সেই অভীষ্ট সাংঘিক সমাজ প্রতিটি শ্রেণী এবং তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের বিলুপ্তি ঘটাবে। তথাকথিত রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটবে, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বন্দ্বের প্রাতিষ্ঠানিক দ্যোতনা।

–কার্ল মার্কস

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
চরম হিংসা ও বিদ্বেষের ব্যাপক প্রসার	১
দেশে-বিদেশে	২
মোদি সরকারের চরম বিড়ম্বনা	৩
ফ্যাসিবাদের অশনিসংকেত	৪
ফ্রান্স : মৃত্যু দাঙ্গা ও কিছু পর্যবেক্ষণ	৫
গণতন্ত্রের উৎসব	৬
প্রতিরোধে লড়াই জারি থাকুক	৭
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ...	৮
অর্থনৈতিক উন্নয়নে... ভারত-চিন	৮

70th Year 35th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 15th July 2023

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েত নির্বাচন এক নিষ্ঠুর প্রহসন

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের পক্ষে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা থেকে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা—এক চরম রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক বিপর্যয়ের পর্বে রাজ্যবাসীর চেতনা ক্ষতবিক্ষত বেদনার্ত। সেই টি এম সি বনাম বিজেপি'র বাইনারি, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রত্যাশিত তৃণমূল বিজেপি'র যৌথ প্রযোজনায় নাটক; ভোট গণনা এবং ফলাফলের পর অগ্নিদাহ ও হত্যা। সব মিলিয়ে অসংখ্য জখম, অভিযুক্ত, সর্বোপরি পঞ্চান্ন জন শিশু নারী বৃদ্ধের বীভৎস মৃত্যুর ধারাবাহিকতা। প্রতিবারের মতো মানবিক বোধহীন কর্মসূচি, মৃতের হেড কাউন্ট করে মমতা সরকারের মৃতের পরিবারের জন্য অনুদানের নিষ্ঠুর পরিহাস।

শবদেহ কোন দলের পতাকায় ঢেকে দেওয়া হল, সেই বিষয়টি আজ ভীষণই গৌণ। এই হত্যালীলায় যে উলুখাগড়ারা নিহত হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিবৃত্ত পরিবারের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ। এতই তাঁদের জীবিকার সংকট যে, গ্রামীণ নব্যধনিক আশ্রিত রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার জ্বালানি হতে বাধেনি।

এরাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে ছিল কৃষক আন্দোলন, শ্রেণি সংগ্রাম ও নিম্নবর্গের উত্থানের ধারাবাহিকতা। এর ফলশ্রুতিতে দেশে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বামপন্থীদের উদ্যোগে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল স্তরের শ্রেণিবিন্যাসে গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন। নিম্নবর্গের হাত ধরে ভূমি সংস্কার ও কৃষি সহ গ্রামীণ উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। পরবর্তীতে পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রণের রাশ চলে যায় সরাসরি দলীয় নেতৃত্বের হাতে।

ধীরে ধীরে পঞ্চায়েতে ক্ষমতার শ্রেণিবিন্যাসে গ্রামীণ নব্যধনিক শ্রেণির আধিপত্য বিস্তারের ফলে রাজ্যে শাসনক্ষমতার ভরকেন্দ্রটি চলে আসে পঞ্চায়েতে। কৃষিতে আয় হ্রাস, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ও গ্রামে সরকারি চাকরির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীদের হাতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প সহ সমগ্র অর্থনীতির দখলদারিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হয়। রাজ্য সরকারের প্রকল্প ও রাজ্যকে টপকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ আছে বেনিফিশিয়ারিদের। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন এ রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছে ২০২১ থেকে ২০২৬ এর জন্য ১৭২০০ কোটি টাকা। সেই হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু বছরে ১ কোটি। এছাড়া সরাসরি বেনিফিশিয়ারিদের একাউন্টে ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা। জলজীবন মিশন, গ্রামীণ বিদ্যুদায়ন ইত্যাদিও পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত।

মমতা সরকার যেভাবে ভূমি সংস্কার ও অধিগ্রহণের নিয়ম বদলে দিয়েছে তাতে সম্পত্তির হস্তান্তর, জমির ব্যবহার ও গ্রামীণ উৎসকে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের সিংহ ভাগ পঞ্চায়েতের হাতে। সুতরাং এই সব সুযোগ এবং সরকারি প্রকল্প এবং রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তাবাদী প্রকল্পের কমিশন-কাটমানির ভুক্তাবশেষ দিয়েই গত এক দশক ধরে গ্রামীণ বেকারদের হিংসার অগ্নিকুণ্ডে বলি দেয় শাসকদল। অপর দিকে অতিষ্ঠ বিপর্যস্ত মানুষকে সময় বিশেষে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ও টাকার ঝুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধী অভিনয় করে বিজেপি। এমনকী গ্রামবাসীর অধিকার একশ দিনের কাজ, মিড-ডে মিলের টাকা বন্ধ করার শাসানি দেয়। বিজেপির তৃণমূল বিরোধিতা ও ডাবল এঞ্জিনের ক্ষমতার সন্ত্রাস নির্মাণে।

এবার তৃণমূল ও বিজেপির বোঝাবুঝির ব্যাপারটা রাজ্যপালের অতিসক্রিয়তা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহারের বিশৃঙ্খলার পর রাজ্যবাসীর কাছে স্পষ্ট। ভোটের ফলাফলেও দেখা গেছে এই ব্যাপক সন্ত্রাসের মুখোমুখি বামপন্থীদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করে তাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজে নিচ্ছে।

শুধু দুর্নীতি নয়, গ্রামীণ মানুষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও সচেতন উদ্যোগে সর্বজনীন উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের বাস্তবায়নের সঙ্গে ভূমি সংস্কারের অপূর্ণ কাজ সম্পূরণ এবং গ্রামীণ শ্রমিকদের কাজ ও নিরাপত্তার দাবি নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২০২৪-এর লোকসভার ভোটে বিজেপিকে রাজ্যের রাজনীতি থেকে উচ্ছেদ করতে পারে একমাত্র বামগণতান্ত্রিক শক্তি। স্বাধীনোত্তর ছটি দশক এই ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থীদের নেতৃত্বেই এ রাজ্যের মাটিতে সংঘ পরিবার পা রাখতে পারে নি। তৃণমূল কংগ্রেসই সংঘ পরিবারকে শুধু প্রতিষ্ঠিত করেনি, সংগঠন প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছে। অস্ত্র বোমাবাজি ও বধির তথা অন্ধ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দর্শনকে মূলধন করেই এই যুগ্ম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

চরম হিংসা ও বিদ্বেষের ব্যাপক প্রসার

গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠায় শহিদদের লালসেলাম এই সংগ্রাম আরও ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালে নিবিড় পরিকল্পনার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস নামে একটি আদ্যন্ত দুর্বৃত্ত নির্ভর দল রাজ্যপাটে। দল না বলে একজন স্বৈরতন্ত্রীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত রাষ্ট্রে ক্ষয়প্রাপ্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফিনান্স পুঁজির তাঁবেদারি করতে এ দেশ জুড়ে নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলির ব্যাপক বাস্তবায়ন সম্ভব করতে বামপন্থী শক্তিসমূহর প্রভাব কমিয়ে ফেলার লক্ষ্যেই মমতা ব্যানার্জীকে সর্বতোভাবে মদত দিয়েছিল। এ সব বিষয় পূর্বেও নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু বা অত্যাচার নিরবচ্ছিন্নভাবে জনজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করতে না পারলে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের গভীর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। সে পথে চলতে গেলে গণতান্ত্রিক আর্থ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ অবসান একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। সে পথেই মমতা ব্যানার্জীর মতো এক নীতি আদর্শহীন কিন্তু, অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে ক্ষমতাশীর্ষে বসানো হয়েছিল। এই সরল সত্যটি সম্পর্কে বিতর্কের কোনও সুযোগ আর নেই। সামান্য অভিনিবেশ সহকারে পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার দিকে নজর দিলেই এই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

বামপন্থীদের শক্তিশালী ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের সংগ্রামী বামপন্থী ভাবাদর্শ থেকে যে কোন ভাবে বিচ্যুত করতে না পারলে পুঁজি নির্দেশিত স্বৈরশাসন টিকবে না এ বিষয়টি আর এস এস কথিত 'দুর্গা' ভালই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বলা ভাল তাঁর ওপর এ ধরনের নির্দেশ পাঠিয়েছিল তাঁর নিয়োগকর্তারা। ২০১৪'র পর ভারতের জঘন্যতম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যারা নিয়মিত নির্দেশ দিয়ে পরিচালনা করে তারাই প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রকল্প অনুযায়ী মমতা ব্যানার্জীকেও নিবিড়ভাবে পরিচালনা করে গেছে। মোদি ও মমতার দৈনন্দিন আচরণ, শাসন প্রক্রিয়া এমনকি, বাগভঙ্গির মধ্যে একান্ত মিল বিনা কারণে নয়। পরামর্শদাতা যে এক এবং অভিন্ন। সুতরাং, মিল খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনও সমস্যা থাকার কারণ নেই। একই অচল পয়সার দুই দিক।

সদ্য সংঘটিত পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রহসনের বিস্তারিত বা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সর্বত্রই একটি ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক সর্বনাশ করে চলা চরম নিষ্ঠুর এক স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির দাপাদাপি। নির্বিকার চিত্তে গণহত্যার আয়োজন এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে বামগণতান্ত্রিক দলগুলির প্রার্থী ও সমর্থকদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার অনবদ্য কৌশল। পুলিশ ও প্রশাসন এখন আর দলদাস নয়। এখন তারা একান্তভাবেই দলের অলিখিত পতাকাবাহক। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য পুলিশ বস্তুত ভাড়াটে সেনাবাহিনীর মতো বিরোধীদের দমন করে স্বৈরশাসিকার প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার পর নিজেরাও গুলি চালিয়ে বহু তরুণকে হত্যা করেছে। এমন নৃশংসতা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে ফেলেছে।

দিল্লি এবং বাংলার একই চরিত্রবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শাসকদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনী সময়মতো পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছোয়নি। অতি নিকৃষ্ট মানের এক ক্রীড়নক নির্বাচন কমিশনার নির্লজ্জের মতো উচ্চ আদালতে ধিক্কৃত হবার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ এবং গণনা হবে বলে স্থির হয়। স্বাভাবিক কারণেই রাজ্য সরকার এ বিষয়টি মেনে নেয়নি। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে গোপন আঁতাত হতে পারে। কিন্তু সি আর পি এফ, বি এস এফ বা সি আই এস এফ প্রভৃতি আধাসেনা বাহিনীর সমস্ত আধিকারিক বা কর্মচারীদের সঙ্গে সেই আঁতাত বাস্তবে সম্ভব নয়। তাঁরা একবার অকুস্থলে উপস্থিত হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যথাবিহিত আচরণ করবেন। সুতরাং প্রয়োজনীয় সংখ্যায় বাহিনী ঠিক সময়ে রাজ্যে পাঠানোই গেল না, নানা অজুহাতে এমন গভীর অন্যায় হয়ে চললো।

৮ জুলাই ভোটগ্রহণের দিন ব্যাপক সন্ত্রাস, ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল এবং গ্রামে গ্রামে ভীতি প্রদর্শন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করা হলো। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিকল্পিত অনুপস্থিতিতে অনেক বুথেই নামমাত্র পুলিশ বা সিভিক ভলান্টিয়ার তৃণমূলী লুম্পেনদের অবাধ সহযোগিতা করে গেল। সংবেদনশীল বুথ বা ভোট কেন্দ্রের তালিকা বারংবার জানতে চেয়েও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের কাছে তা গোপন রাখা হলো। রাজ্য প্রশাসন দুর্বৃত্তদের সহায়তা দিতে সদা সক্রিয়। ভোটের দিনেও বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ভয়াবহ হাঙ্গামা, বোমাবাজি, গুলির ব্যবহারে বহুসংখ্যক মানুষের প্রাণনাশ। ১১ জুলাই গণনার সময় আরও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেল। বিডিও, এসডিও এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সকলের প্রত্যক্ষ মদতে তৃণমূলী দুর্বৃত্তদের লাগামছাড়া তাণ্ডব। মানুষের মৃত্যু মিছিল চলতেই থাকল। আতঙ্কিত হবার প্রসঙ্গ যে, নির্বাচনী

—এরপর ৮ পাতায়

চিনে নয়া বৈদেশিক সম্পর্ক আইন

সম্প্রতি চিন সরকার বিশ্বে মূলত আমেরিকার ক্ষমতার আধিপত্য প্রশমন করা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার লক্ষে নয়া বৈদেশিক সম্পর্ক আইন চালু করেছে। এই আইন যখন তখন ইউরোপ আমেরিকার পক্ষ থেকে অন্যান্য দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রতিবন্ধকতামূলক নির্দেশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেবে। জি পিং-এর শাসনকালে এই আইনের মাধ্যমে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চিনের সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির লক্ষে অনেকগুলি আইন প্রচলনের সুপারিশ করা হয়েছে । চিনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অভিজাত গোষ্ঠীগুলিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান এবং দেশের মধ্যে দুর্নীতি বিভেদপন্থা ও বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ সংঘাত বন্ধ করে সারা পৃথিবীতে বহু মেরু সম্পন্ন ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির ভারসাম্য সৃষ্টি করা চিনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেন জি পিং। নয়া আইন সেই উদ্দেশ্য সফল করার পথ সুগম করবে বলে প্রত্যয়শীল কমিউনিস্ট পার্টি ও চিন সরকার। আন্তর্জাতিক পরিসরে বহুজাতিক সভ্যতা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের প্রতিবন্ধক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতিরোধে এই নয়া আইন। এরকম বিশ্বাস অভিজ্ঞ মহলের।

দক্ষিণ কোরিয়ায় তেজস্ক্রিয় তরল নিঃসরণের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজ

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে বিকল ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় দূষণ সম্পন্ন জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের বক্তব্য, জাতিসংঘের তেজস্ক্রিয়তার উপর নজরদারি সংস্থা গত দুবছর ধরে বহুমুখী সমীক্ষা করে ঘোষণা করেছে যে, জাপানের পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবহৃত জল সমুদ্রে এসে মিশলে সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ড. রবার্ট রিচমন্ড রাষ্ট্রসংঘের তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর সঙ্গে সহমত নন। তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীর সমুদ্রজল অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ, কর্পোরেট উদ্যোগে ব্যাপক মাছধরা এবং এ ধরনের অজস্র কারণে ক্রমশ বেশি করে দূষিত হয়ে পড়ছে। ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জল এই প্রদূষণে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করবে। এভাবে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজ কিছুটা সরব বলেও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা কর্পোরেট সংস্থাগুলির কোন হেলদোল নেই।

কিউবা এবং ভিয়েতনামের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করার লক্ষে দু দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ

সম্প্রতি ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা লে হোয়াই ক্রুঙ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক রবার্টো মোরালেসের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে হাভানাতে পৌঁছেছেন। উভয় নেতৃত্বই প্রবাদপ্রতিম বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো এবং হো চি মিনের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য স্মরম করেন। তাঁরা দুটি দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের প্রতি সহমর্মিতার প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

লে হোয়াই ক্রুঙ আমেরিকার আধিপত্যবাদী ভূমিকা এবং কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি কিউবার রাষ্ট্রীয় উদোগে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো এবং ভিয়েতনাম-কিউবার চাল উৎপাদনকারী যৌথ প্রয়াসগুলি পরিদর্শন করেন।

জলবায়ুর পরিবর্তন ঃ উষ্ণতম জুন ২০২৩

ইউরোপীয় ইউনিয়নের জলবায়ু মনিটরিং সংস্থা কোপার্নিকাস এ বছরের জুন মাসকে মানবেতিহাসে উষ্ণতম মাস বলে ঘোষণা করেছেন। এবছর স্পেনে অনাবৃষ্টি, চিন আমেরিকায় অভূতপূর্ব লু, এল-নিনোর সঙ্গে তুলনীয়। ১৯৯১-২০২০ সালের গড় উষ্ণতার তুলনায় সারা বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বেশী ছিল এবছর জুন মাসে। কোপার্নিকাসের সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ সহ কানাডার কিয়দংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার পূর্বভাগে তাপমাত্রা বৃদ্ধি নতুন রেকর্ড করেছে। এদিকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও রাশিয়ার পশ্চিমভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কম ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী গত ৪ জুলাই উষ্ণতম দিন। আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এধরনের ভূ-উষ্ণায়ন ঘটে চলেছে। অ্যান্টার্কটিকায় নাকি বরফ গড় পরিমাণের তুলনায় ১৭ শতাংশ কম জমেছিল। অধিকাংশ জলবায়ু ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ এই উষ্ণায়নের জন্য ভোগবাদী এবং মুনাফালোলুপ সভ্যতাকেই দায়ী করছেন।

অত্যধিক জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার, প্রতি বছর প্রায় চার হাজার লক্ষ টন কার্বন ডাই অক্সাইড ও গ্রীন হাউস গ্যাসের উৎপাদন, মানবসভ্যতাকেই ধ্বংসের মুখোমুখি এনে ফেলেছে। ফলে শস্যের উৎপাদনে ঘাটতি, হিমবাহের গলন, বনে জঙ্গলে দাবানল, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, ডিহাইড্রেশন সহ বিভিন্ন রোগের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এবং লুসিয়ানাতে এবছর ১৩ জন মানুশ অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় মারা গেছেন। চিনে উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত সরকারি সতর্কতা ঘোষণা, ব্রিটেনে জল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ভূ-উষ্ণায়নের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ঘটছে।

সারা বিশ্ব গত ১৮০০ শতাব্দীর তুলনায় কম করেও ১.২০ সেন্টিগ্রেড অধিকতর উষ্ণ, অথচ আন্তর্জাতিক স্তরে বহু আলাপ আলোচনা ইত্যাদি চলা সত্ত্বেও উষ্ণতা হ্রাস করার জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

মহারাষ্ট্রে অজিত বনাম শরদ পাওয়ার

মহারাষ্ট্রে এন সি পি'র পরবর্তী প্রজন্মের নেতা অজিত পাওয়ার তাঁর কাকা দলের প্রতিষ্ঠাতা শরদ পাওয়ারকে একরকম চ্যালেঞ্জ করেই বিজেপি'র চক্রান্তে সাড়া দিয়ে রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনার পিছনে শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সারা দেশের রাজনীতির টানাপোড়েনের ইতিহাস রয়েছে। অজিত আর একজন শিবসেনার 'দলবদলু' নেতা একনাথ শিন্ডের মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু নিজে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে দর কষাকষির পাঞ্জাটা কষে রাখলেন। 'মহারাষ্ট্রের' তথাকথিত আঞ্চলিক সত্তার ভাবাবেগকে দুজনেই আঘাত দিয়েছেন বলে দুজনেই বিজেপির কাছে সমান গুরুত্ব দাবি করলেও, শিবসেনা বা এন সি পি'র মূলস্রোতের কাছে তাঁরা দুজনেই বিশ্বাসঘাতক। বাধ্য হয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে নিজে থেকেই ঘোষণা করছেন যে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রীসভায় অজিত পাওয়ারের গুরুত্ব কখনই তাঁর থেকে বেশি নয় এবং তাঁর নেতৃত্বে শিবসেনার যে অংশ এখন সরকারে আছে, তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভের গুজব ছড়াচ্ছে একদল চক্রান্তকারী।

যাহোক আপাতত এন সি পি'র ভাঙনের প্রশ্নে বলা যায় যে শরদ পাওয়ার ৬ জুলাই-এর দিল্লিতে জাতীয় কার্যকরী সমিতির সভায় প্রফুল প্যাটেল, সুনীল তাৎকারে, এস আর কোহলী, পি সি চাকো প্রমুখ ১৩ জন প্রথম সারির নেতাকে বহিষ্কৃত করেছেন।

ওদিকে অজিত পাওয়ার ঘোষণা করছেন যে দিল্লিতে শরদ পাওয়ারের আহূত এনসিপি'র জাতীয় কার্যকরী সমিতির সভা বাস্তবে মূল্যহীন, কারণ তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন অধিকাংশ সদস্য। অজিত পাওয়ারই এনসিপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে। দল ভেঙে দেওয়ার দুদিন আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে অজিত সেই দাবিই পেশ করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে দলের নির্বাচনী প্রতীকও নাকি তাঁরই প্রাপ্য। এই রকমই দাবি করেছেন অজিত নির্বাচন কমিশনের কাছে।

ওদিকে দিল্লিতে রাহুল গান্ধী নিজে শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করে তার দল কংগ্রেসের ১০০ শতাংশ সমর্থন জানিয়ে এম ভি এর ঐক্য সুদৃঢ় করার আহ্বান রেখেছেন মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের কাছে।

মহারাষ্ট্রে গত দুটি বছর ধরে যা চলছে তাতে প্রমাণিত শুধু মহারাষ্ট্র কেন বিভিন্ন রাজ্যে যেখানেই অ-বিজেপি সরকার নির্বাচিত হয়েছিল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ষড়যন্ত্র করে দল ভাঙনের খেলায় নেমেছে আধিপত্যবাদী ফ্যাসিস্ট দল বিজেপি। কর্ণাটকে পরাজয়, পাটনায় অ-বিজেপি দল সমূহের যৌথ মঞ্চের প্রস্তুতি এবং আগামী ১৭-১৮ জুলাই সেই মঞ্চের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্গালুরুতে পরবর্তী সভা, প্রতিটি ঘটনাতেই ২০২৪ এর নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে। শুধু তাই নয়, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাস্টার স্ট্রোক ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুলের মণিপুর এবং তেলেঙ্গানা সফরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় দলটিকে ভীষণই নার্ভাস করে দিয়েছে।

২০২৪-এর নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত হলে কর্ণাটকের মত প্রতিটি এজেন্ডাতেই তাদের ধাক্কা খেতে হবে। যে ইডি, সিবিআই বিজেপি'র পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি চোখেও দেখতে পাচ্ছে না, অথচ বিরোধী দলগুলিকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব পুনপ্রতিষ্ঠিত হলে বিজেপি'র একটি নেতাও ছাড় পাবেন না। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠছে বলেই এত তাড়াহুড়ো করে কখনও এনসিপি ভাঙছে, কখনও ইউসিসি আইন চালু করার জন্য অধীর হয়ে পড়ছে আর দিন গুণছে কখন রামমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলে হিন্দুত্বের ঢাকের আওয়াজ সংখ্যাগুরু ভোটারদের কানে পৌঁছে দেওয়া যায়।

মণিপুরের সংকটের প্রভাব পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপরও পড়ছে

মে মাসেই অগ্নিগর্ভ মণিপুর থেকে প্রায় ১২০০০ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে সীমানা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে প্রবেশ করেছেন। ৩০০০ বাস্তুত্যাগী মানুষ অস্থায়ী শিবিরে ঠাঁই পেয়েছেন। বাকীরা আত্মীয় বন্ধুদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিপূর্বে সামরিক শাসন কবলিত মায়ানমার থেকে পালিয়ে বহু মানুষ মিজোরামে প্রবেশ করেছে। রাজ্য প্রশাসনের আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও মিজোরামকে সংকট মোকাবিলার জন্য আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করেনি। মিজোরামে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে ১৫০০০ ছাত্রদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়েছে।

মিজোরামের সীমান্ত ঘেঁষে রয়েছে মায়ানমার এবং মণিপুর। মায়ানমারের চিন উপজাতিদের সঙ্গে মিজোরামবাসীদের দীর্ঘদিনের আত্মীয়তার সম্পর্ক যেমন রয়েছে, অপরদিকে মণিপুরের কুকিদের সঙ্গেও মিজোরামবাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে মিজোরামে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও মায়ানমার থেকে আগত বাস্তুত্যাগীদের অনুপ্রবেশ চলছেই।

মিজোরাম রাজ্য সরকার, নাগরিক সমাজ এবং গীর্জার মত সংস্থাগুলি মিজোরামে আশ্রয়গ্রহণকারীদের সাহায্য করার জন্য কাজ করে চলেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সমস্যার সার্বিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের প্রয়োজন। সমগ্র অঞ্চলেই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টে মোদি সরকারের চরম বিড়ম্বনা

মনোজ ভট্টাচার্য

(এক)

গত ১১ জুলাই মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেট -এর প্রধানতম ব্যক্তি সঞ্জয় কুমার মিশ্রর নিযুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধি অবৈধ। জাস্টিস বি আর গাভাই, জাস্টিস বিক্রম নাথ এবং জাস্টিস সঞ্জয় কুরোলের সম্মিলিত বেঞ্চ এই তাৎপর্যপূর্ণ রায় দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাদের বিশেষ বিড়ম্বনায় ফেলেছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে, আগামী ৩১ জুলাই-এর মধ্যেই বর্তমান ডিরেক্টর সঞ্জয় কুমার মিশ্রকে পদত্যাগ করতে হবে। নতুন কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আর কোনও টালবাহানা করা চলবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে সঞ্জয় কুমার মিশ্রকে এক বছরের জন্য ইডি'র শীর্ষপদে বহাল করে মোদি সরকার। তাঁর কার্যকাল তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পরে ২০২১-এর নভেম্বর তাঁর চাকুরির মেয়াদ এক বছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার ২০২২ সালে চার বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। ইডি'র শীর্ষপদে বহাল হবার আগে সঞ্জয় মিশ্র ইনকাম ট্যাক্সের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

মোদি জমানায় তাঁর কর্মকুশলতা সম্পর্কে বিশেষ প্রচার ছিল। এই আই আর এস আধিকারিক নাকি অর্থনৈতিক অপরাধ রোধ করতে এবং অপরাধীদের শাস্তিবিধানে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছেন। এইসব তথ্য (সঙ্গত বা অসঙ্গত) উল্লেখ করেই মোদি এবং শাহ ঘনিষ্ঠ এই ব্যক্তিকে ইডি'র শীর্ষ পদে বসানো হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সঞ্জয় মিশ্র আর চাকুরিতে বহাল থাকতে পারবেন না। ইডি দেশের বা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীন। বর্তমান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেই সঞ্জয় মিশ্রের কাজকর্মের সম্পর্ক। সুপ্রিম কোর্টের এমন তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশের পরে অর্থমন্ত্রী নিশ্চুপ। তাঁর অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবর্তে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে এই নির্দেশের কিছুটা বিরূপ সমালোচনা করে চলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আইন বা বিধিমতো ইডি'র কাজকর্মের সঙ্গে বাস্তবে কোনভাবেই যুক্ত নয়। অমিত শাহ যেহেতু স্বৈরশাসকের সর্বাপেক্ষা অনুগত এক নেতা ফলে তাঁকে সক্রিয় হতেই হয়।

মনে রাখতে হবে যে, সঞ্জয় মিশ্রকে ইডি'র শীর্ষপদে নিয়োগ করে দেশের কমপক্ষে ১২২ জন বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে ইডিকে লেলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিজেপি'র পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই বিশেষ পদমর্যাদার আধিকারিক। সরকারের দুই শীর্ষ ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ মোদি এবং শাহ'র সমস্ত নির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে পালন করে গেছেন এই ব্যক্তিটি। পুরস্কারস্বরূপ এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেটের কর্মচারীর সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সকলেই জানেন যে, মোদি সরকারের অপশাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বহু লক্ষ স্থায়ী পদে সমস্ত নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। দেশের যুবসমাজ তীব্র বেকারত্বের যন্ত্রণায় পড়ে থাকলেও মোদি-শাহ সরকার কোনভাবেই উদ্বিগ্ন নয়। কিন্তু সরকারের সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করতে সিবিআই বা ইডি'র মতো সংস্থাগুলিকে তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে। এই দপ্তরগুলিতে বৈধ বা অবৈধভাবে কর্মী নিয়োগ চালু রয়েছে। পুলিশ, মিলিটারী সরকারি গোয়েন্দা প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে এবং তাদের সবাইকে একান্ত অনগত করে তুলেই ফ্যাসিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়।

বিগত শতাব্দীর জার্মান রাষ্ট্র নাৎসি পার্টির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী শাসনের গতিপ্রকৃতি ও ইতিহাস লক্ষ করলে এই সত্যটি অনুভব করা সম্ভব। নরেন্দ্র মোদি যে সেই পথে চলতেই বদ্ধপরিকর সে বিষয়ে সংশয়ের কোনো বাস্তব কারণ নেই। সাধারণ মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে বিরোধী রাজনীতিকদের বহু সামাজিক অপরাধের সঙ্গে যুক্ত দেখাতে পারলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং তাঁরা প্রতিষ্ঠিত সরকারের সমস্ত অপকর্মকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর এস এস ও বিজেপি সেই পথে চলতে সচেষ্ট। সবকিছু একই রকম হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই। স্থানীয় বা দেশীয় অনেক পার্থক্য থাকে। সেগুলিকে মান্যতা দিয়েই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সম্ভব যেমন করতে হয়, একইভাবে ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান সম্পর্কেও এইসব বিষয়গুলি স্মরণে রাখা বিশেষ জরুরি।

'ইডি'র মতো একটি অমিত শক্তিশালী সরকারি সংস্থাকে একান্তভাবে পোষ মানা প্রাণীদের মতো বশংবদ করে তুলতে পারলে দেশের সরকার নিরুপদ্রব হয়ে স্বচ্ছন্দে যা খুশি তাই করে যেতে পারে। মোদি সরকার সে কারণেই সিবিআই, ইডি, এনআইএ প্রভৃতির ওপর প্রশ্নাতীত আধিপত্য বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সদা তৎপর। এই সব সংস্থাগুলির শীর্ষ কর্তৃত্বকারী আধিকারিকদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখান না মোদি বা শাহ। এরাই তো আপাতত ভারতের ১৪৩ কোটি মানুষের ভাগ্যবিধাতা! যত লজ্জার হোক, বাস্তব সেটাই।

ইতিপূর্বে দেখা গেছে সিবিআই-এর শীর্ষ অধিকর্তা আলোক বর্মাকে গভীর রাত্রে ক্যুদেতার মতো কায়দায় পদচ্যুতি ঘটানো হয়েছিল। তাঁর পরিবর্তে গুজরাত ক্যাডারের এক বিশ্বস্ত আইপিএস অফিসার আস্থানাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল।

(দুই)

দেশের অর্থনৈতিক অপরাধগুলির তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিবিধানের (প্রমাণসাপেক্ষে) প্রধান সরকারি সংস্থার নাম এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেট বা ইডি। ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীনে এই সংস্থাটি কাজ করে। ১৯৫৬ সালের ১ মে এই সংস্থাটির কার্যকাল শুরু হয়। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

ইদানীংকালে ভারতের জনমানসে বিশেষ চর্চিত এই সংস্থাটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। দেশের মধ্যে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বা অন্যকোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত করে সত্য উদ্‌ঘাটনে এই সংস্থার বিশেষ তাৎরপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে ইডির তদন্ত চলে তাঁদের সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে অবশ্যই পড়তে হয়। স্বাভাবিকভাবেই ইডি'র আতঙ্কে বহু মানুষই তটস্থ থাকেন। মোদি সরকারের জমানায় এই বিশেষ প্রভাবশালী সংস্থাটির সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের বহু সঙ্গত অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে বা হয়েই চলেছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কোনও না কোনভাবে মোদি সরকারের বিরোধিতা বা সমালোচনা করেন তাঁদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে ইডি'র দুর্ব্যবহার এখন অতি সাধারণ বিষয়। কোনও না কোন কারণে বা অজুহাতে কোনও বিরোধী নেতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রমী কিছু সূত্র পেলেই তাঁকে দমন করতে কেন্দ্রীয় সরকার যথেচ্ছভাবে ইডিকে ব্যবহার করে চলেছে। সন্ত্রস্ত করে চলেছে বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত অনেককেই। আবার অন্যায় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত কোনও নেতা যদি দলত্যাগ করে মোদির দলে অর্থাৎ বিজেপিতে যোগদান করেন তাহলে, তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কিত তদন্ত বা অনুসন্ধান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ অনন্ত বা ভূরি ভূরি।

অল্প কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্রের এন সি পি নেতা অজিত পাওয়ার, যাঁর বিরুদ্ধে ৭০০০০ কোটি টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ ছিল। তাঁকে ব্যবহার করে শরদ পাওয়ারের এনসিপি দলটিকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে দল ভেঙে বিরোধী পক্ষের শক্তি বিশেষভাবে কমিয়ে দেবার পুরস্কারস্বরূপ অজিত পাওয়ারকে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রীর পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কৌতুককর, এই ব্যক্তিটিকেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

তাঁর সঙ্গেই দীর্ঘকাল ইডি'র তদন্তে জেরবার হওয়া ছগন ভুজবল প্রমুখকেও মন্ত্রীপদে শামিল করা হয়েছে। আট জন এনসিপি বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে অজিত পাওয়ার দল ভেঙেছেন। এনসিপি'র দীর্ঘকালের সক্রিয় নেতা এবং ব্যবসায়ী প্রফুল প্যাটেল ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে ইডি তদন্ত চলেছিল তা থেকে দলবদলু সবাইকে পূর্ণত মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এমন অনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে ইডির ব্যাপক সংযুক্তি সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দুর্বল করতে বা ভেঙে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার আকছার এমন চরম অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে চলেছে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নেত্রী সোনিয়া গান্ধি কিংবা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধেও ইডি তদন্ত চলছে। মাঝেমধ্যেই তাঁদের তলব করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিবিড়ভাবে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করা চলছে। কিছুমাত্র প্রমাণ জোগাড় করতে পারলেই তাঁদের কারারুদ্ধ করা একান্তই সহজ হয়ে পড়বে। স্বস্তির বিষয় যে, এখনও পর্যন্ত ইডি সাফল্য পায় নি। উত্তরপ্রদেশের প্রমুখ বিরোধী রাজনীতিবিদদের তটস্থ করে রাখার ব্যবস্থা চালু। বিএসপি নেত্রী মায়াবতীকে তো বেশ কয়েকবছর ধরেই প্রায় নির্বাক করে রেখেছে। তিনি আর মোদির কোনও সমালোচনা করতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ নাকি ইডি ইতোমধ্যেই সংগ্রহ করে রেখেছে। তাঁকে আতঙ্কিত করেই মোদি তাঁর অপশাসন বজায় রাখতে উদ্‌গ্রীব।

অবশ্য মায়াবতীর মতো বহুসংখ্যক নেতা নেত্রীই চরম দুর্নীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বলে জনশ্রুতি। কিন্তু দেশের প্রায় সবকটি রাজ্যেই ইডি বা সিবিআই তদন্তের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখাটা মোদি জমানায় স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত। যেমন খুসি তেমনভাবে এই সমস্ত ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ইচ্ছেমতো লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, মোদি বা অমিত শাহ'র কোনও সমালোচনা করাও তো দেশদ্রোহের সামিল বলে বিবেচিত হচ্ছে! গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় এক অসহনীয় দমবন্ধ করা অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ইডি ও সিবিআই-এর ব্যাপক ব্যবহার চলছে তা, মোদি ও অমিত শাহ'র নির্দেশ অনুসারে চলছে না। পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতেই হয় যে, মমতা ব্যানার্জীর পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত নেতা কর্মীদের বিপুল পরিমাণে দুর্নীতির সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে বলে প্রায় অকাট্য অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গে যে অরাজকতা বিস্তারলাভ করেছে তার সঙ্গে এমন ব্যাপক বা দিগন্তবিস্তৃত আর্থিক দুর্নীতির গভীর সম্পর্ক। এদের বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে তা একান্তভাবেই রাজ্যের উচ্চ আদালতের নির্দেশে।

বেশ কিছুকাল যাবৎ উচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধানেই এই তদন্ত চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বহুসংখ্যক নেতাই, এখন কারান্তরালে। তাঁদের অপরাধের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ। সহস্র কোটি টাকা তছরুপ করে নিজেদের এবং তাঁদের দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এইসব নেতা নেত্রীরা কিংবা তাদের সহযোগীরা। অভিযোগ, এই দুর্নীতিবাজ দলটির শীর্ষ নেতৃত্বও এমন অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। গভীর পরিকল্পনা করেই রাজ্য সরকারের সবকটি মন্ত্রকে বা দপ্তরে চাকুরি দেওয়া হয়েছে বিপুল অর্থের বিনিময়ে। শিক্ষকদের মতো সম্মানীয় পদেও অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছে। যোগ্যরা পথে বসে। বহু বছর যাবৎই বিচারের বাণী স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বলতেই হয় যে শুধুমাত্র বিচারব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে যথার্থভাবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না। গণ আন্দোলনকে তীব্রতর করেই সমস্ত ধরনের পাপ থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে হবে।

ভারতে ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদীদের মদতপুষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের অশনি সংকেত

দিলীপ গোস্বামী

বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিপদ জনজীবনকে দ্রুত বিপর্যস্ত করতে চলেছে। ভারতের ক্ষমতাসীন দলটির প্রত্যক্ষ মদতে পুষ্ট বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ এক অশনি সংকেত। সবুজায়নের বিকল্প বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিপদ এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ব- বাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বর্তমান সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাত্র ২০ বছর আগে যে মানুষটি গুজরাতে হিংসা ও মুসলিম রাষ্ট্র প্রযোজিত গণহত্যার জন্য আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ধিকৃত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপীয় ইউনিয়নে যার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, সেই মানুষটিই আজ পরিবেশ সংরক্ষণের আন্দোলনের দুনিয়ায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে সোচ্চারে দাবি করছেন বিশ্বপ্রেমিক এবং মহান রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নাকি তিনি অভিনন্দিত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জি-২০ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সম্প্রতি এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর বিপুল উপস্থিতিতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাষ্ট্রনেতারা জলবায়ুর আসন্ন বিপদ নিয়ে বিস্তারিত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেন এবং ভূস্বর্গের সৌন্দর্য ও মনোরম পরিবেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষীবেষ্টিত এমন এক অঞ্চলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল যা নিপীড়ন ও গণসমাধিস্থলের কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। চিন, সৌদি আরব, তুরস্ক, মিশর বাদে বহু দেশের প্রতিনিধিরাই বাস্তুতান্ত্রিক ভ্রমণশিল্পের (Eco Tourism) এই মহাসম্মেলনে হাজির ছিলেন। মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামের তথাকথিত স্বঘোষিত নেতা ও প্রবক্তারা যথা কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ দেশের নেতৃবর্গ বাস্তুতান্ত্রিক ভ্রমণ শিল্পের তকমায় এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মহাসম্মেলনে সানন্দে সামিল হয়েছিলেন।

বিস্মৃতির গর্ভে চাপা পড়েছে কলঙ্কিত পুরানো ইতিহাস। এই উপমহাদেশের শাসন ক্ষেত্রে একমাত্র সর্বাধিনায়ক বর্তমানে বাস্তুতন্ত্র বান্ধব সবুজ পৃথিবী নির্মাণ আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্‌গ্রীব। ঠাণ্ডা যুদ্ধের নবতম সংস্করণে পশ্চিমী দুনিয়ার মিত্র হিসাবেই বন্দিত হবেন, নিঃসন্দেহে। জুন মাসেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এই উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র দেশ ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা, পরিচ্ছন্ন শক্তি, মহাকাশ সব কিছু নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই মৈত্রীবন্ধন আরও পাকাপোক্ত হবে, এমনটাই আশা করছেন রাজনৈতিক মহল। এমন এক পরিস্থিতিতে নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রারম্ভে ১৪৫ কোটি মানুষের দেশের ক্ষমতাসীন প্রধান মানুষটি 'অস্পৃশ্য' বলে বিবেচিত হতেই পারেন না। তাঁকে পাশ্চাত্য দুনিয়া সবুজ আন্দোলনের নেতা (Green Guru) হিসাবেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। প্রসঙ্গত ২০১৮ সালে (Green Guru) কে রাষ্ট্রপুঞ্জে সর্বোচ্চ পুরস্কারে "Champion of Earth"-এ ভূষিত করেছে। সৌর শক্তি প্রসারে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ও ভূমিকার জন্যই নাকি এই পুরস্কার! মাত্র দুই দশকের মধ্যেই এই অবিশ্বাস্য রূপান্তর। আর্থ-রাজনীতির চাপে এই দুনিয়ায় কত কিছুই ঘটতে পারে! সমান্তরালে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশিত তথ্যেই জানা যায়, ভারত কিভাবে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের উপর আক্রমণ শানিত করে চলেছে। বর্তমান সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সাল থেকে সুপরিচিত পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন এবং মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনে যুক্ত সংগঠনগুলি সহ সারা দেশে ১৯০০০ হাজারেরও বেশি এন জি ও-র কাজকর্ম ব্যাপক কাটছাঁট হয়েছে। ২০১৯ সালে গেট্‌স ফাউন্ডেশন মোদীকে স্বচ্ছ ভারত নির্মাণ আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের নায়ক হিসাবে Global keeper সম্মানে ভূষিত করেছে। ঐ বিশেষ দিনটিতেই দুইটি দলিত শিশুকে প্রকাশ্যে খোলা ময়দানে মলত্যাগ করার জন্য নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। অদ্ভুত বৈপরীত্য!

মজার ঘটনা, হিন্দুত্ববাদীদের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজ আন্দোলনের ভাবমূর্তিটিকে উজ্জ্বল করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন পরিবেশ আন্দোলনের প্রধান মানুষ এরিক সলহাইম ভারতের পক্ষে ওকালতি করে বলছেন, ভারতই একমাত্র দেশ যাকে অনুসরণ করতে হবে। হচ্ছেটা কী! ষড়যন্ত্রের শেকড় কত গভীরে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সংগঠিতভাবে কল্প কাহিনী নির্মাণ যজ্ঞ চলেছে। অবশ্য লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের এবং আদিবাসী ও দলিতদের আটক রাখার জন্য প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র চলছে। বিপুলায়তন Detention Centre বা আটক শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে। নাগরিকত্ব আইনের জোর লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের বন্দী করে রাখার জন্য বিপুল আয়োজন চলছে। প্রশ্ন হল, এ সবই হচ্ছে কী তথাকথিত সবুজ পৃথিবী নির্মাণের লক্ষ্যে, Eco fascism এর বাস্তবায়নে পাখির চোখ করেই এগোচ্ছে জঘন্য ষড়যন্ত্রীরা। ১৯৩০-১৯৪০ এর দশকে ভারতে হিন্দুত্ববাদী তাত্ত্বিক নেতা ভি ডি সাভারকর এবং এম এস গোলওয়ালকর জাতীয় স্বাভিমানকে (National pride) উর্ধতম স্তরে সাফল্যের সাথে নিয়ে যাবার জন্য এডলফ হিটলার এবং বেনিতো মুসোলিনিকে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে বলেছিলেন এঁরা হিন্দুত্ববাদীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। বর্তমান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাক্তন পরিবেশ আধিকারিক এরিক মনহাইম বলছেন বর্তমান ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের প্রধান প্রেরণাদাতা নরেন্দ্র মোদী ভারতীয়দের মধ্যে নাকি আত্মসচেতনতা এবং স্বাভিমানের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন এমন মনে করেন। পশ্চিমী দুনিয়াকেই ভারতের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে এমন কথাও বলছেন। নিপুণভাবেই এক ভয়ঙ্কর দুষ্টচক্রের নির্মাণ হচ্ছে।

বিস্ময়কর ঘটনা, মোদীকে "Green Guru" হিসাবে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এক অংশে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে অথচ পরিবেশ সংরক্ষণের সূচিতে ভারতের স্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্নে ১৮০তে। ভারতের স্থান ১৫৫ থেকে ১৮০তে পৌঁছেছে। আমরা কী গর্বিত না লজ্জিত? এমন প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এমন ঘটনাকে বাস্তুতান্ত্রিক ভণ্ডামি (Eco-Hypocricy) না বলে বরং বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদই (Eco Fascism) বলা সংগত। পরিবেশ রক্ষার বাহানায় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্মাণ ও গণহত্যার সুচতুর প্রকল্প।

প্রসঙ্গত নাৎসীরাও উন্নত বাস্তুতান্ত্রিক প্রকল্পের কথা বলেছিল। ডাচাউ (Dachau) মৃত্যু শিবিরে জৈব লতাপাতার (Organic Herb Garden) বাগান নির্মাণ করেছিল, আউসউইৎসে গ্যাস চেম্বার থেকে নির্গত বায়ুদূষণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রকল্পও নির্মিত হয়েছিল। এই পৃথিবীকে জাতিগত যাবতীয় দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যেই নাকি এত সব কর্মকাণ্ড পরিকল্পিত হয়েছিল। বিচিত্র মিল দুই যুগের দুই চরম ফ্যাসিবাদীর।

প্রসঙ্গত গত অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিবকে নিয়ে তথাকথিত "Unity Statue" পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছিলেন এই স্থান থেকেই "Life style for Environment" এর কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। ৫ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে, ৫০০০ আদিবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিশ্বের সর্বাধিক উচ্চতাসম্পন্ন এই Statue of Unity" নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তবুও এই মূর্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে "Statue of Unity" । ভণ্ডামির এই নিদর্শন আগামী দিনের মানুষ নিশ্চয়ই ঘৃণার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বাস্তুতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিপদ নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়।

ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষকদের কয়েকটি কর্মসূচি এখানে উল্লেখ করা হল, যা থেকে এই বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

(১) পৌরাণিক গৌরবগাথাগুলিকে জনমানসে প্রতিষ্ঠি করতে হবে।

(২) শত্রুকে নিধন করার জন্য নিত্যনতুন শত্রু আবিষ্কার করতে হবে।

(৩) হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তো মুসলিমদের দূষিত ভাইরাস এবং জৈব দূষণের জন্য দায়ী করে চিহ্নিত করে যাদের নিশ্চিহ্ন করেই পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করতে হবে। নাৎসীরাও তো প্রায় একইভাবে ইহুদীদের পরজীবী আগাছা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

ইতিহাসের বিদ্রুপ ধ্রুপদী নাৎসীবাদ এই ধরাধাম থেকে প্রায় একশত বছর আগে বিদায় হওয়া সত্ত্বেও, গান্ধী আম্বেদকারের দেশ এই ভারতে "Eco-Fascism' রূপে জনমানসে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

রাজনৈতিক মহল, শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন, সংবাদ মাধ্যম এবং সর্বোপরি জনগণের মধ্যে তেমন কোনও হেলদোলের আঁচও পাওয়া যাচ্ছে না।

১৭-১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বিরোধী দলসমূহের সভা

দেশের চরম সর্বনাশ করা আরএসএস-বিজেপিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থেকে সমূলে উৎপাটন করাই এখন ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষের একান্ত কর্তব্য। গত ২৩ জুন পাটনা শহরে এই লক্ষ্যে সমস্ত বিরোধী দলগুলি সভার মধ্য দিয়ে বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস শুরু হয়। একেবারেই প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হয়েছে। এই সভায় যেসব দলগুলি উপস্থিত ছিলেন, তারা সবাই যে শেষপর্যন্ত বিরোধী ঐক্যে সামিল থাকবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। পাটনার সভায় আরএসপি আমন্ত্রিত ছিল না।

আগামী ১৭-১৮ বেঙ্গালুরুতে দ্বিতীয় দফার সভা হচ্ছে। এবারে অবশ্য আরএসপি নেতা কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। এই ঐক্য প্রয়াস নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বই এখনও পর্যন্ত অমীমাংসিত। লক্ষ্য একটিই, বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে দেশের সংবিধান,ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করা।

ইরানে নারী নিগ্রহ চলছে অবিরাম

ইরানে মহিলা সাংবাদিক নিলোফার হামেদি নারীদের বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর সম্পাদক ইনস্টাগ্রামে পরিবেশিত একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ইসলামিক পোশাক সম্পর্কিত বিধি (Islamic Dress Code) অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মেয়েটি ইরানের এক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। নিলোফার হামেদি দেরী না করে সেই হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে এক মর্মান্তিক দৃশ্যের মুখোমুখি হন। হাসপাতালে মৃতপ্রায় তরুণীটিকে জড়িয়ে ধরে তাঁর আত্মীয়স্বজন শোকপ্রকাশ করছেন। তরুণীটির পুলিশি নিগ্রহে হাসপাতালেই মৃত্যু হয়। নিলোফার এই ঘটনার ছবি তুলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করার পরে সংবাদটি 'ভাইরাল' হয়ে পড়ে। সরকারবিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন সারা ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে এই ঘটনার পর সরকার বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন বেশ কয়েক মাস চলেছিল। অবশ্য নিলোফার হামেদি এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁকে নিগৃহীতা তরুণী আমিনির পরদিনই (Sep. 16) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমিনির মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর আর এক মহিলা সাংবাদিক ইলাহি মহাম্মদি আমিনির সৎকারের সময় তাঁর শহরে উপস্থিত হলে, তাঁকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই দুই মহিলা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা নাকি বিদেশি গোয়েন্দাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করছেন।

ইরানের মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামী কর্মীরা দেশে সাংবাদিকতার প্রকৃত অবস্থার নিন্দা করে বলেন এই প্রতিবাদ আন্দোলনে এখন পর্যন্ত ৫৭৩ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ৭ জন্য প্রতিবাদীকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়েছেন এবং আরও ৮ জন চরম শাস্তির জন্য দিন গুনছেন।

এই হচ্ছে ইরানে প্রতিবাদ চিত্র। প্রতিবাদ আন্দোলন কয়েক মাস লাগাতার চললেও শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে পড়ে এবং হিংস্র দমন পীড়নে বর্তমানে প্রতিবাদ আন্দোলনকে সমর্থন করা বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার অপরাধে এখনও পর্যন্ত মোট ৯৫ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

নিলোফার হামেদি তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি শুধু সাংবাদিক হিসাবে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। প্রবল অত্যাচারেও নত না করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এই মহিলা সাংবাদিক সাংবাদিকতার দুনিয়ায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁকে কুর্নিশ জানাতেই হচ্ছে।

ফ্রান্স : মৃত্যু দাঙ্গা ও কিছু পর্যবেক্ষণ

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

নায়েল নামে এক অভিবাসী-সন্তানের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েকদিন প্যারিস সহ একে একে ফ্রান্সের সবকটা বড় শহর ক্রোধে জ্বলে উঠেছিল। বছর সাতেরোর পিৎজা ডেলিভারি বয় প্রতিদিনের মতো মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিনও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরা তার আর হল না। নায়েলের মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে বছর তিনেক আগে আমেরিকায় জর্জ ফ্লয়েডের ঘটনাকে। পুলিশি তল্লাশির নামে রাস্তায় ফেলে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছিল যাকে। গোটা আমেরিকা উত্তাল হয়েছিল, সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছিল এই রাষ্ট্রীয় বর্বরতায়। অথচ একের পর এক ঘটনাগুলি এভাবে ঘটেই চলেছে ও চলবে এবং আমরা ফুটবল মাঠে, কিলিয়ান এমবাপে বা কারিম বেনজেমার ফরাসি পরিচিতিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে ফরাসি ফুটবলের জয়গানে মুখরিত হব। আমরা জানতেও পারব না, ফুটবল দলে 'কালো' ও 'বাদামি'র এই আধিক্য ও আধিপত্য শ্বেতাঙ্গদের মনে ঘৃণা ও লজ্জা সঞ্চার করে কিনা।

যাই হোক, কাজের কাজ তো কিছু পারব না। অন্তত খানিকটা ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করা যাক পরিস্থিতি সম্বন্ধে। যে পরিস্থিতির শিকার সেদিনের এক মৃত্যু ও এক খুন। হোক না ঘটনা অন্য দেশের, আমাদের দেশের দলিত বা সংখ্যালঘুরাও কি আজ সমাজে খুব নিরাপদ আছেন? পুলিশি অতিরেকের নমুনাও কি এদেশে খুব কম পড়িয়াছে? খবরের কাগজের পাতা তো সেই সাক্ষ্য দেয় না।

ফ্রান্সের অভিবাসন পরিস্থিতিকে অতি সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়। ২০১৪'র হিসেব অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষের দেশ ফ্রান্স। তার মধ্যে ছয় কোটির জন্ম ফ্রান্সের মাটিতে। পৌনে এক কোটি অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১১.৬ শতাংশ জন্মেছেন বিদেশের মাটিতে। বিশুদ্ধ বিদেশির সংখ্যা ছয় শতাংশের কিছু বেশি। অভিবাসী-সংখ্যার নিরিখে ফ্রান্সের স্থান ১৫ নম্বর স্থানে। জার্মানি, ব্রিটেন, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের অনেক নীচে।

বিবিধ গবেষণার সূত্রে জানা যায় যে ফ্রান্সের জাতীয় অর্থব্যবস্থার উপর অভিবাসীদের চাপ অতি নগণ্য কেন? কারণ তাঁরা অধিকাংশ যেহেতু বয়সে তরুণ, স্বাস্থ্য, পেনশন প্রভৃতি সরকারি পরিষেবার অতি ক্ষুদ্রাংশের তাঁরা ভোক্তা। বরং কর্মসংস্থান ও ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা হিসেবে তাঁরা অর্থনীতিতে নিজেদের অবদান রাখেন।

অতএব ধনী রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে খাওয়ার জন্য অবিভাসীরা নিজের দেশ ছাড়েন না। জীবনের নানা দুর্বিপাকে দেশান্তরি হতে তাঁরা বাধ্য হন। তাঁরা এসে দেশের মানুষের মুখের গ্রাসও কেড়ে খান না বরং তাদের মুখে কিছুটা হলেও গ্রাস তুলে দেন। ধনী সাহেবের বাড়িতে, ধরা যাক, কোনো কালো বা বাদামি মানুষ লনের ঘাস ছাঁটার কাজ করেন, তার ফলশ্রুতি কী দাঁড়ায়? না, সে বাড়ির গিন্নি হয়তো কিছুটা অবকাশ হাতে বাড়তি পেয়ে যান। সে সময়টা কাজে লাগিয়ে গিন্নি হয়তো আরো সুদক্ষ শ্রমের মাধ্যমে কিছু রোজগারের ধান্দা দেখতে পান। অর্থাৎ বাদামি মানুষটি সে দেশের মানুষের চাকরি কাড়লেন তো না-ই বরং চাকরি পাওয়ার একটি উপযুক্ত পরিস্থিতি বা সুযোগ তৈরি করে দেন। আসলে অভিবাসী জনগণের উপস্থিতির সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকটের বাস্তবে কোনো নেতিবাচক সম্পর্ক না থাকলেও অর্থনৈতিক সংকটের ন্যায্যতা স্বরূপ বর্ণবিদ্বেষ দেশীয় জাতির চেতনায় কলা বৃদ্ধি করে।

গুলির ঘায়ে যে অ্যালজেরীয় কিশোরটি প্যারিসের অদূরে নঁতের শহরে সেদিন তার ভবলীলা সাঙ্গ করল, যার পরিণতিতে এত তাণ্ডব—সেই নায়েল ছেলেটি কেমন ছিল? বা সাধারণত ওর মতো ছেলেগুলি হয় কেমন? আমরা নই, ফরাসি ভাষায় মরক্কোর অভিবাসী লেখিকা লেইলা স্লিমানি এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন :

বিকেল ছটায় পার্কে শুরু হয় ছেলেদের দলের দৌরাত্ম্য। ওদের সবাই চেনে। রযু দ্য দ্যাঁক্যার্ক, গার দ্যু নর থেকে এরা আসে। সবাই জানে কচিকাঁচাদের খেলার মাঠে এসে ওরা মৃত্যুর সঙ্গে বাজি লড়ে। সাজানো ফুলের টবগুলোর মধ্যে পেচ্ছাব করে। বাওয়ালি করে। ওদের দেখেই আয়ারা মাটি থেকে সাত তাড়াতাড়ি তাদের কোটগুলো তুলে নেয়, বালি ঝেড়ে তুলে নেয় বালি তোলার বেলচা। তারপর প্র্যামের গায়ে হাতব্যাগটা ঝুলিয়ে পাততাড়ি গোটায় (ঘুমপাড়ানি গা, অনুবাদ লেখক)।

আর এসব অবাধ্যতাকে টিট করতে পুলিশি প্রতিবিধানটি কী রকম? তারা অভিবাসী শরণার্থী ক্যাম্পে ঢুকে ইচ্ছেমতো তল্লাশি চালায়, ঘরদোর জিনিসপত্র ভেঙে-গুঁড়িয়ে মাঠ করে খাদ্য ও পানীয় বাইরে ছুঁড়ে ফেলে, এছাড়া গালমন্দ ও আড়ং ধোলাইয়ের দাওয়াই তো আছেই। এবং এই দৈহিক ও মৌখিক হিংসা আইনের ধারা ও উপধারা দ্বারা দিব্যি সিদ্ধ হয়ে যায়।

অস্বীকার করার উপায় নেই, ফরাসি বিপ্লব ও গণ-প্রজাতন্ত্রী ঐতিহ্য ফ্রান্সের সর্বোত্তম ভূষণ। বা ১৭৮৯-এর সেই সুবিখ্যাত মানবাধিকারের ঘোষণা : সকল মানুষ জন্মাবধি স্বাধীন ও সমান—যার দৌলতে স্বাধীনতাকামী ভারতের মতো ইংরেজের অতীত-উপনিবেশের চোখেও ফ্রান্স হয়ে ওঠে যেন মানবমুক্তির বাতিঘর।

কিন্তু অক্ষরদেহী তত্ত্ব বা কথা যত মহৎই হোক, তার ফলিত অনুশীলন কিন্তু ঘামে-রক্তে অন্য গল্প বলে। ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশের পরেই দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত ফ্রান্স কি কখনো চেয়েছিল তার গণ-প্রজাতন্ত্রী আদর্শকে নিজের উপনিবেশে ছাড়পত্র দিতে? না। কারণ আফ্রিকা ও এশিয়ার পিছড়ে বর্গকে সমানাধিকার প্রদানে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের অসম্ভব অনীহা। নইলে প্রভু ও ক্রীতদাসে আর প্রভেদটা রইল কোথায়? এবং এই প্রশ্নে বাম ও দক্ষিণপন্থী নির্বিশেষে সব ফরাসি মুরুব্বিরই মোটামুটি এক রা গোটা ঔপনিবেশিক কাল ব্যেপে ঔপনিবেশিক আইনে নানা সংস্কার সাধিত হয়েছে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনো হেলদোল নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত অত্যাচার, অন্যায় পেষণ অব্যাহত।

মহাযুদ্ধ পরবর্তী দশকগুলিতে ফ্রান্সে লোকবল-সংকটের নিদান স্বরূপ পুরনো উপনিবেশগুলি থেকে লোকজন আনা হয় কলকারখানা ভরাট করার জন্য। ১৯৭০-এর দশকের অর্থনৈতিক সংকটে এই অভিবাসী-নীতি প্রথম ধাক্কা খায়, জোগান-প্রবাহটি রুদ্ধ হয়। গণ-বেকারত্বের আবহে তৈরি হয় প্রবল অভিবাসন-বিরোধী হাওয়া। অভিবাসীদের প্রতি সমাজের আজকের বিদ্বিষ্ট মনোভাবের সেই হল সূত্রপাত।

মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্রীয় বর্ণবিদ্বেষ ও গণতন্ত্রের মধ্যে খুব একটা ধাতুগত বিরোধ কিন্তু নেই। বরং তা রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয়তারই প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্র সমাজকে বৈচিত্র্যর মধ্যে যেন কল্পনাই করতে পারে না। দেশি-বিদেশি অন্তর-বাহির, জাতীয় – আন্তর্জাতিক, কালো-সাদা—নিজেকে ও নাগরিককে এবম্বিধ নানা বাইনারির শৃঙ্খলে বেঁধে না রাখতে না পারলে বোধহয় রাষ্ট্রের ঘুম হয় না।

তাই শাসনের সুবিধার্থে আধুনিক রাষ্ট্রকে জাতিতত্ত্বর উদ্ভাবন করতে হয়। এক জাতি 'সাদা' 'সভ্য' ও 'সংস্কৃতিবান' অন্য জাতি 'অসভ্য' 'কালো' ও 'প্রায় অমানুষ' 'প্রায় প্রকৃতির অংশভাক'। অতএব ভুললে আমাদের চলবে না, আপাতদৃষ্টিতে 'আধুনিক গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রও প্রকৃত পক্ষে জাতিবিদ্বেষী। পরিচয়পত্র—যা এখন প্রায় প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক—ফ্রান্সে প্রথম চালু হয়েছিল বিদেশিদের ক্ষেত্রে, আম-নাগরিকের জন্য প্রচলন হয় আরো অনেক পরে।

রাষ্ট্রের মূলীভূত এই জাতিবিদ্বেষ চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ করে পুলিশ, বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদ মাধ্যম প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সুতরাং বর্তমান ফ্রান্সের রাস্তাঘাটে অবাধ পুলিশি ধরপাকড়-জেরা বর্ণ ও ধর্মের নিরিখে ধারাবাহিক ভাবে বৈষম্যমূলক হয়ে পড়ছে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। শোনা যায়, পুলিশ বিভাগে সম্ভাব্য অপরাধীর জাতিভিত্তিক আদল গড়ার রেওয়াজ ওদেশে স্বীকৃত এক পদ্ধতি। রাত-বিরেতে পুলিশ ফাটকে একটু ঢুঁ মারলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। বেশিরভাগই 'কালো' বা 'বাদামি' মানুষ। পুলিশের ভাষায় 'আফ্রিকান' বা 'উত্তর-আফ্রিকান' মুখের ধাঁচ—এরাই কিন্তু ধরপাকড়ের সহজ নিশানা। ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গর তুলনায় 'কালা আদমি'-র এই নিশানায় পড়ার সম্ভাবনা প্রায় পাঁচ-ছয় গুণ বেশি। এবং এই প্রবণতা পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশগুলির তুলনায় ফ্রান্সে আবার ইষৎ অধিক।

গুলিতে, শ্বাসরোধে বা তাড়া খেয়ে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুর সংখ্যা বিগত চার দশকে অনধিক পাঁচশোয় গিয়ে ঠেকবে। রাষ্ট্রের গুলিতে মৃত্যুর ৬০ শতাংশ নিরস্ত্র অভিবাসী নাগরিক।

প্রশ্ন, পুলিশের এই যে বৈষম্যমূলক অমিতাচার—তার উৎস কি এক ব্যবস্থাগত মূল্যবোধ যা প্রাত্যহিক অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি পুলিশের মধ্যে চাড়িয়ে যায়? নাকি ব্যক্তি পুলিশের একত্রিত মূল্যবোধ সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতায় পরিণতি পায়? এর সহজ উত্তর—কেউ বর্ণবিদ্বেষী বলে তো পুলিশের চাকরি নেয় না। বরং পুলিশ পেশায় অভিবাসীদের সংখ্যা এখন মোটেই নগন্য নয়। তবে এঁদের উপর প্রবল চাপ থাকে অভিবাসী পরিচয়টিকে অবদমন করার। এই অবদমন-প্রয়াস বহু ক্ষেত্রে পরিণতি পায় দমনের অমিতাচারে। অতএব ব্যবস্থাগত নৈতিকতা ও অভ্যাসের মধ্যেই হয়তো এই বিদ্বেষের বীজ কোথাও সুপ্ত থাকে।

এই প্রেক্ষিতে পুলিশি ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো দুরস্থান, বিচার ব্যবস্থা তার সঙ্গে বরং প্রতিনিয়ত হাত মিলিয়ে চলে। এই প্রসঙ্গে উচ্চ ন্যায়ালয়ের ২০১৬-র একটি রায় প্রণিধানযোগ্য, যার বলে অভিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে পুলিশি দমনের অতিরেক আইনি সিদ্ধতা পেয়ে যায়।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বামেদের অবস্থান কী? বামেদের বিশেষ কোনো বক্তব্য বা কার্যক্রম আছে কি? এইসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। এটুকুই শুধু বলা যায়—নায়েলের মৃত্যু-পরবর্তী দাঙ্গার পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের সরাসরি মদত নেই। তবে, অন্যান্য সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক দল খোলাখুলি দাঙ্গার নিন্দা করলেও, ফ্রান্সের নয়া বাম দল লা ফ্রঁস অ্যাঁসুমিজা তার, এই দাঙ্গার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দাঁড়ানোর থেকে নিজেদের বিরত রেখেছে। তাই তারা আবার সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীদের আক্রমণের লক্ষস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে শুধু তো পুলিশ, ও আইন-আদালতে সীমাবদ্ধ নয় এই ব্যবস্থাগত বিদ্বেষ। রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজও তার সংবাদ মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থাও তার দায় এড়াতে পারে না। শুধু দুই একটা কমিশনের প্রহসন বা মামুলি শাস্তি বিধান করে কি এই মহারোগ থেকে অব্যাহতি মেলা সম্ভব?

‘‘গণতন্ত্রের উৎসবে’’ প্রান্তিক মানুষের রক্তে হোলিখেলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম রাজনীতির বাস্তব স্বরূপ

সৌম্য শাহীন

ভাঙ্গড়ে আবার রাষ্ট্রীয় মদতে গণহত্যা!! রাজ্য সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়ে খুন করলো অসংখ্য মানুষকে। গত মাসের সাত তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই মনোনয়ন দাখিল করাকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড়। গত এক মাস ধরেই কার্যত ভাঙ্গড়ে রক্তের হোলিখেলা চলছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি’র বাইরে এই একটিমাত্র বিধানসভা আসনেই জয়লাভ করে সংযুক্ত মোর্চা। আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকী ২৬ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেজাউল করিমকে। তারপর থেকেই বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে, বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মঞ্চে এই তরুণ নেতার বক্তব্য নজর কেড়েছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। ফলে শাসকদলের রোষানলে পড়তে হয় তাঁকে এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ৪২ দিনের জন্য আরো ১৮ জন সহযোদ্ধার সঙ্গে জেলবন্দী হয়ে থাকেন নওশাদ। অতঃপর আদালতের সিদ্ধান্তে জামিন পেয়ে ভাঙ্গড়ে ফেরা মাত্র বিপুল জনউন্মাদনা তৈরি হয় তাকে নিয়ে। এবং পঞ্চায়েত ভোটের আগে নতুন করে আশায় বুক বাঁধে আইএসএফ-বাম কর্মীরা। দিকে দিকে শুরু হয় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ।

বিগত বিধানসভায় এনআরসি আতঙ্কের পরিবেশে দক্ষিণবঙ্গের মুসলিমরা একচেটিয়া ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে বাধ্য হন। তারপর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত পণবন্দীদের মত ব্যবহার করতে শুরু করেন মুসলিম সমাজকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসিন খানের কথা। যোগীরাজ্যের কায়দায় পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাড়িতে ঢুকে এনকাউন্টার করে খুন করে তরতাজা এই তরুণকে। তদন্ত তথা বিচারের নামে প্রহসন হয়। এমনকি আনিসের পিতা সালেম খানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন বিচারক রাজশেখর মান্থা এবং তাঁকে হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

বস্তুত, আনিসকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজকে সবক শেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী রাজনীতিকে, বিশেষত যদি সেটা মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসে, তাহলে তাকে নির্মমভাবে দমন করা হবে। এরই উল্টো পিঠে তার সুরে সুর মেলানো ‘‘বীরভূমের চাষার ব্যাটাকে’’ রাজ্যসভার জন্য মনোনীত করে বুঝিয়ে দিলেন যে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট রাখতে কলাটা-মুলোটা দরাজ হাতে বিলোতে কোনো আপত্তি নেই মমতা ব্যানার্জীর।

তৃণমূলের শাসনকালে অর্থনৈতিক ভাবে এমনিতেই গ্রাম বাংলা ধুঁকছে। কর্মসংস্থান নেই, স্কুল ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধারাবাহিক দুর্নীতির ফলে ভেঙে পড়েছে, আট হাজারের বেশি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার, ছাত্রদের হাতে মিড ডে মিলটুকু যাতে না দিতে হয়, তার জন্য কারণে অকারণে লম্বা ছুটি দেওয়া হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে। এই অবস্থায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর যুবকদের একমাত্র আয়ের রাস্তা হলো শাসক দলের ফুট সোলজার হিসেবে কাজ করা। পাথর - বালি - কনস্ট্রাকশন সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত হওয়া বা পঞ্চায়েতের হাতে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা খাতে আসা টাকা থেকে প্রাপ্ত কাটমানির সামান্য ভগ্নাংশ-এগুলোই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। নেতাদের মধ্যে টাকার ভাগ নিয়ে বিরোধ ঘনীভূত হলে এদের হাতে দুটোই বিকল্প–হয় বিপক্ষকে মারো অথবা তার হাতে মরো। এবং বিপক্ষ বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেসেরই অপর কোনো গোষ্ঠী, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গতবছরে বীরভূমের বগটুই গ্রামে ভাদু শেখ বনাম সোনা শেখ নামক শাসকদলের দুই স্থানীয় নেতার মধ্যে রেষারেষির ফলে অসংখ্য প্রাণের অকালে ঝরে যাওয়া।

মহাভারতের জতুগৃহ পর্বে যেমন পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর প্রাণ বাঁচাতে বলি দেওয়া হয়েছিল এক নিষাদ মা ও তাঁর পাঁচ সন্তানকে, তেমনই বগটুইতে ভাদু হত্যার প্রতিশোধ নিতে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল শিশু নারী বৃদ্ধ সহ দশজন নিরপরাধ মানুষকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এই ট্র্যাডিশনকে বজায় রেখেই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে সরকারি হিসেবে মতো যে পঞ্চাশজনেরও বেশি মানুষ খুন হয়েছেন, তার অধিকাংশই দরিদ্র মুসলমান। এরাই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক, আবার হিংসার রাজনীতির অগ্রণী সৈনিকও, নিছকই দাবাখেলার বোড়ে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু রাজনীতির একটা বৃহত্তর দিক রয়েছে, যা জাতীয় রাজনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভয়াবহ রাজনৈতিক হিংসার মাধ্যমে ২০১৮-এর বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েতের মডেল বাংলার মানুষ মেনে নেন নি, পরের বছরেই লোকসভা নির্বাচনে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। ২০১৪ সালের ৩৪টা আসন থেকে ২০১৯-এ এক ঝটকায় তৃণমূলের আসনসংখ্যা নেমে আসে ২২এ, অপরদিকে বিজেপি ২ থেকে ১৮য় পৌঁছে যায়।

কিন্তু মাত্র দু’ বছরের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস, ২১৩টি আসন এবং প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বিজেপি লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে নিজেদের ভোট ধরে রাখতে পারলেও বাম-কংগ্রেসের ভোট ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। অধিকাংশ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে দক্ষিণবঙ্গে একচেটিয়া ভাবে মুসলিম সমাজের ভোট জোড়া ফুলে যাওয়ার ফলেই সে যাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী বৈতরণী সাফল্যের সাথে পার করতে সক্ষম হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভালোই বোঝেন যে মুসলিম সমাজের এই আনুগত্য হারালে তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারানোর সমূহ সম্ভাবনা। গত দু বছরে আই এস এফের উল্কাসদৃশ উত্থান এবং বামফ্রন্টের সঙ্গে মসৃণ জোটের ফলে সেই মুসলিম ভোটের একটা বড় অংশই আজ তাঁর হাতছাড়া। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খোয়াব দেখতে মগ্ন মমতা তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে টার্গেট করেন নওশাদ ও তাঁর অনুগামীদের। আইএসএফের গড় ভাঙ্গড়কে বিশেষভাবে নিশানা করা হয়। কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রধান ভোটব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ভোটে ধ্বস নামলে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী জোটের নেতৃত্ব পাওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে পড়তে হবে তাকে। ফলে ‘‘উন্নয়নের দিনমজুরদের’’ হাতে নগদ টাকা এবং অজস্র অস্ত্রের জোগান দেওয়া শুরু হয়। তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নির্বাচনের আগেই ভাঙ্গড়ে মৃত্যু হয় অন্তত তিনজনের। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের ফলে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস ভাঙ্গড়ে এসে এলাকা পরিদর্শন করেন।

এই ধরনের সন্ত্রাসের বাতাবরণেই গত ৮ জুলাই ভাঙ্গড়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন তুমুল গণপ্রতিরোধের ফলে বেশিরভাগ জায়গাতেই তৃণমূলের মস্তান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর শুরু হয় ফলাফলের জন্য গণমানুষের প্রতীক্ষা।

১১ জুলাই সকাল থেকেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কার্যত তৃণমূলের মুছে যাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত জয়ের খবর আসে– রাত আটটার সময়ে আইএসএফের জেলা পরিষদ প্রার্থী জাহানারা বেগম ৫৪০০ ভোটে জয়যুক্ত হন। সকাল থেকে গণনা কেন্দ্রে কড়া নজর রেখেছিলেন আইএসএফ-বাম কর্মীরা। জয়ের আনন্দে কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা উৎসবে মেতে ওঠেন। সেই সুযোগে আরাবুল ইসলামের নেতৃত্বে তৃণমূলী গুণ্ডাবাহিনী গণনাকেন্দ্রে দখল নেয়। শুরু হয় ব্যালট বাক্সে ভানুমতীর খেল। রাত দশটা নাগাদ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করেন।

প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামে গ্রামবাসীরা। রাষ্ট্রের ট্রিগার হ্যাপি পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এখনো পর্যন্ত সরকারী ভাবে চারজন আইএসএফ কর্মীর মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়েছে। আরো কতজন গুলিবিদ্ধ এবং গুরুতর আহত তার সবটুকু এখনো স্পষ্ট নয়।

সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা যদিও চার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কম করে সাত-আটজন আইএসএফ কর্মী মারা গেছেন বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। ভগবানপুর অঞ্চলের এক বিরোধী কর্মীর বক্তব্য যে বহু মৃতদেহ গায়েব করে দিয়েছে আরাবুলের গুন্ডা বাহিনী এবং এই কাজে তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে রাজ্য পুলিশ। তার এই দাবি সমর্থন করেন এলাকার আরো বহু বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ জুন এই তরুণ পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের জন্য প্রার্থীপদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে খুন করার চেষ্টা করে এবং তাঁর সমস্ত নথিপত্র ছিঁড়ে দেয়। অথচ কাশিপুর থানার পুলিশ তাঁর এফআইআর নিতে অস্বীকার করে, উল্টে রাত্রিবেলায় পুলিশ তাঁর বাড়িতে এসে খানাতল্লাসির নামে মহিলা ও শিশুদের হুমকি দেয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় সিপিআইএমের অন্যতম নেতা এবং রাজ্য কমিটির সদস্য তুষার ঘোষের বক্তব্য, রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের যে আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল অনেকটাই পূর্বনির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। মনে রাখা দরকার, ৮ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে পরের দিন থেকেই নমিনেশন চালু করে দেয় রাজ্য নির্বাচন কমিশন। মাত্র ছয়দিন দেওয়া হয় মনোনয়ন পত্র জমা করার জন্য। এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্তে একটা বিষয় স্পষ্ট–ঠিক কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কায়দায় রাজ্য সরকারও সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে পার্টির অনুগত ভৃত্যে পরিণত করেছে।

বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ সহ বিরোধী কণ্ঠস্বরগুলোকে গলা টিপে হত্যা করে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-বিজেপির বাইনারিকে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা। ‘‘আরএসএসের দুর্গা’’ সেই কাজটাই নিপুণভাবে করে চলেছেন। এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে বামপন্থী কর্মী-সমর্থকরা দিকে দিকে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। ১৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার বিকেল চারটের সময় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মৌলালি পর্যন্ত বামফ্রন্টের ডাকে তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচার ও গণতন্ত্রহীনতার বিরুদ্ধে এক বিরাট সমাবেশ ও পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। বাম নেতৃত্বের আশা, সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল মানুষ এই মিছিলে যোগ দিয়ে শাসকশ্রেণির বিপক্ষে তাদের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন।

এই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তার লড়াইটা অসম্ভব দুরূহ, কিন্তু সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত ফ্রন্টেই আন্দোলন জারি রাখতেই হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রগতিশীল অংশকে খোঁজার অপচেষ্টার বদলে দিকে দিকে শ্রমজীবী ঐক্য গড়ে তোলাই একমাত্র রাজনৈতিক পথ।

প্রতিবাদে, প্রতিরোধে লড়াই জারি থাকুক

সর্বানী ভট্টাচার্য

আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন
দিয়েছি নরক করে...।
যে মরে মরুক, অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।

শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার এই লাইন দিয়েই এই নিবন্ধের শুরু করতে চাই। রাজ্যের শাসকদলের এটাই বোধহয় প্রকৃত চেহারা। এ দেশে গণতন্ত্রের যতটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল সত্যিই কি তা নির্বাচন? গণতন্ত্রের উৎসব আসলে এমন শবদেহের উপর রচিত হল যা শুধু মর্মবিদারকই নয়, ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তারও বটে। গুন্ডা, মস্তান, তোলাবাজরাই যে শুধু এই সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তা নয়। একান্তভাবেই যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে রাজ্যজুড়ে পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে। তাকে ধিক্কার জানাবার ভাষা নেই।

২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকে জুড়ে রয়েছে হিংসা। নির্বাচন ঘোষণা, একদিনেই ভোট। এবং নির্বাচন কমিশন ও তার প্রধানের ভূমিকার মধ্য দিয়েই রাজ্যব্যাপী অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে শাসকদল এবারের ভোটের ময়দানে আনতে চায়নি। কারণ দুর্নীতি, পাচারের (গরু/কয়লা/পাথর প্রভৃতি) ঘটনা সাধারণ মানুষের সামনে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে তাকে রুখতে হিংসাকে আশ্রয় করা ছাড়া শাসকদলের সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না। আর তাই (২) পুলিশ, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাতে হয়েছে। (৩) মনোনয়ন জমা থেকে আরম্ভ করে ফলাফল পর্যন্ত সার্বিক যে হিংসা চালানো হয়েছে এমনকি ফলাফলের পরেও হিংসা যে থামেনি তা সরকার চাইছে না বলেই। অন্ততপক্ষে ৫০টা মৃতদেহের উপর দিয়ে তাই রাজনৈতিক লড়াই কার্যত হয়ে উঠেছে ক্ষমতায় টিকে থাকার লড়াই। এবং সেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে হিংসাই একমাত্র হাতিয়ার শাসকদলের। আজ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় গ্রামের উন্নয়ন, গ্রামবাসীর জীবিকার সুরক্ষার প্রশ্নে সরকারের মাথাব্যথা নেই। গ্রামসভাগুলি কার্যত অচল। মানুষকে ডোল পলিটিক্সের সুবিধা দিয়ে ভোট কিনতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। তাই রাজ্যের মহিলাদের ৫০০ টাকার লক্ষ্মীশ্রী, অথবা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দিয়ে বলা হচ্ছে ভোট দিলে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। তা নাহলে সব বন্ধ। ভাবখান এমন যেন এগুলি তারা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে দিচ্ছে। এমন এক অজানা ভয় মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বিশেষত বহুক্ষেত্রেই মহিলারা এর শিকার। তারা স্পষ্ট বলে ভোট না দিলে এই প্রকল্পের সুযোগ থাকবে না। কে চালাবে?

ভোট এলেই অজানা ভয়ের বেসাতি চলতে থাকে। আজ আর ক্ষমতায় এলে কি করব শাসক রাজনৈতিক দল বলে না। না এলে কি অবস্থা হবে সেই ভয় ধরিয়ে দেয়। মানুষও নিরুপায়। কিন্তু এবারেও যে বিষয়টা লক্ষ করা গেল, এত ভয় দেখানোর পরও তারা মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি শাসক দল। আর তাই ভোট লুঠ, ব্যালট লুঠ থেকে বিরোধী প্রার্থীকে মারধর করে বা ভয় দেখিয়ে তুলে দেওয়া, হত্যা, আক্রমণ ইত্যাদিকে আশ্রয় করেছে। উত্তর ২৪ পরগনায় বামফ্রন্ট প্রার্থীকে গণনা কেন্দ্রে মেরে তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছে।

বলা যায় কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, সর্বত্র এই হামলা। কেন এটা হচ্ছে? মনে রাখা দরকার ১৯৭৭ সালে বামেরা প্রশাসনিক ক্ষমতায় আসার পরই পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে কিছু ক্ষমতা এসেছিল। বেশ স্বাশাসনের বিষয়টি তখন থেকেই শুরু হয়। বামফ্রন্টের আমলে যে ভূমিসংস্কার হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়। কিন্তু মাঝখানে ৩৪ বছর কেটে যায়। মানুষের মনে কিছু ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। বামফ্রন্টের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয় কিছুটা তাদেরই কিছু কাজকর্মের ফলে। কিন্তু এরপর ক্ষমতার বদল হলে নতুন শাসকরা আসার পরে গ্রামসংসদ বন্ধ করে দেওয়া হল, শুধু তাই নয় এর ফলে গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ কমল–পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের যে মূল দৃষ্টিভঙ্গি 'নিজেদের উন্নয়ন নিজে করা' সেই ভাবনাটাই পাল্টে গেল। শাসকদলের সর্বস্তরের দালাল আর আমলারা ক্ষমতা ভোগ করতে থাকল। রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিস্রুত পানীয় জলের কাজ আর এগোল না। সমৃদ্ধ হল শাসকদলের নেতাকর্মীরা। এই সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, আধিপত্য, বিলাসিতা কেউই ছাড়তে চায় না। প্রশ্ন হল এই সমৃদ্ধির উৎস কোথায়? কোথা থেকে আসছে?

একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে,শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাস ও মানুষের উন্নয়নের জন্য এই নারকীয় রক্তপাত। তা যদি হত তাহলে পুরভোট, বিধানসভা, লোকসভা ভোটেও হিংসা অনেক বেশি বাড়ত। সেইসব নির্বাচনে হিংসা হলেও এঅবস্থা হয় না। এই হিংসার একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি আছে। এককথায় বলতে গেলে প্রতি বছর গ্রামবাংলায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে উন্নয়নের জন্য আসছে, তার একটা বড়ো অংশ লুঠ করার অধিকার পেতেই পঞ্চায়েত ভোটের সময় যেনতেনপ্রকারেন ক্ষমতার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে শাসকদল। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৩২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩৪১টা পঞ্চায়েত সমিতি, ২০টা জেলা পরিষদ ১টা মহকুমার পরিষদ। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ৫ বছরে ৫-১৮ কোটি টাকা পেয়ে থাকে। এছাড়া জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও আলাদা করে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণের জন্য টাকা পায়। যেমন NREGS র টাকা। এটা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সরাসরি আসে। এছাড়া ইন্দিরা আবাসনের টাকা আসে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে। আর এই উন্নয়নের টাকারও একটা বড় অংশই নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের (শাসকদলের) মাধ্যমে চোরাপথে শাসকদলের নেতাদের পকেট স্ফীত করেছে। যে টাকা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আসে তার ৬০ শতাংশ টাকাও ঠিকমত খরচ হলে গ্রামবাংলার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যেত।

বামফ্রন্টের সময়ে যে কাজ হয়েছিল তা ধ্বংস করে ২০১১ সালের পরবর্তীকালের ভোটে পুলিশ, প্রশাসন ও দুর্বৃত্তদের অবাধে ব্যবহার করে বিপুল অর্থের সিংহভাগই তৃণমূলীরা নয়ছয় করল। মৃত ব্যক্তিদের নামেও ১০০ দিনের টাকা তোলা হয়। কিভাবে সম্ভব? কারণ NREGS প্রকল্পের আওতায় কি হচ্ছে তা কখনই সরেজমিনে পরীক্ষা (ফিজিক্যাল অডিট) করার ব্যবস্থা নেই। শুধু খরচের হিসেব দেখে টাকা দেওয়া হয় অনেক বেশি। ফলে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারলেই অর্থাৎ নামের তালিকা, কাজের দিনের সংখ্যা ও প্রাপ্য টাকার হিসেব জমা দিলেই টাকা বেরিয়ে এসে অসৎ প্রতিনিধিদের পকেটে ঢুকে যায়।

NREGS র কাজের অডিট শুধু UC কে ভিত্তি করেই হয়। তাই চুরির সুযোগ অনেক বেশি। এছাড়া প্রতি বছর অন্তর কেন্দ্র রাজ্যকে পরের ৬ বছরে কত টাকা দেবে তা জানিয়ে দেয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ছিল ৪৪১২ কোটি টাকা। তার পরের বছর ছিল ৩২৬১ কোটি টাকা। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে আগামী চার বছর রাজ্য এই খাতে পাবে ৩৩৭৮ কোটি টাকা। রাজ্যে পঞ্চায়েত পিছু বছরে এক কোটি টাকা আসবে শুধু কেন্দ্র থেকে। যদিও সব প্রকল্পের টাকা প্রধান, উপপ্রধানরা ইচ্ছেমত খরচ করতে পারেন না। বহুক্ষেত্রেই জেলাশাসকের অনুমোদন লাগে। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচিত হয় তাই কোনো অর্থ বরাদ্দ করতে গেলে অসুবিধে হয় না শাসকদলের। যথেচ্ছ লুঠ অবাধে চলছে। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সমিতিকে জেলার আয়তন অনুযায়ী টাকা দেওয়া হয়। তার অঙ্ক ৫ বছরে ৪০-৫০ কোটি। সমিতির সভাপতির কাছে এই টাকা আসে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির সভা করে এই অর্থ খরচ করতে হয়। একক ক্ষমতাও আছে সভাপতির। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিডিও বা জেলাশাসকের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু শাসকদলকে কে বাধা দেবে? আমলারা তো বর্তমান রাজ্য সুপ্রীমোর দলদাস। এ নির্বাচনে তা আরো ভালভাবে রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে লুঠতরাজে বাধ সাধবে কে? একটি জেলা পরিষদে পাঁচ বছরে কমবেশী ৫০০ কোটি টাকা খরচ করতে পারে। জেলার ছোট, বড় আয়তনের উপর নির্ভর করে।

বস্তুত পঞ্চায়েত পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিদের যে আর্থিক ক্ষমতায়ন হয় সেটা বিধায়ক সাংসদের হয় না, এই 'মধু ভাণ্ডের কারণেই পঞ্চায়েতের মনোনয়ন এবং ভোট এমনকি, ভোটের ফলাফলে জেতা প্রার্থীকে (বিরোধী দলের) পরাজিত ঘোষণায় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে হিংসার রাজত্ব তৈরি করতে হয়। আর এই অর্থের কারণেই তা বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করার অপচেষ্টা।

কিন্তু যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পঞ্চায়েত গ্রামীণ মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। জনগণের উন্নয়নের কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হওয়া জরুরী। কিন্তু তৃণমূল তা করতে দিচ্ছে না। কিন্তু সেক্ষেত্রে এ বিষয়টা উল্লেখ করা জরুরি তা হল–নিরন্তর লড়াই করেই তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনেকে বলছেন পর্বতসম দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মত এবারের ভোটে প্রকাশিত হল না? ভোট হল কোথায়, যে মতপ্রকাশ হবে?

কিন্তু সারা রাজ্যে এই ভোটে মানুষ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে তৃণমূলী গুন্ডা, পুলিশের আক্রমণকে রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে পারি না যে, পুলিশ ও তৃণমূলের গুলিতে সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী দরিদ্র পরিবারের তরুণ ছেলেমেয়েরাই বেশি সংখ্যায় নিহত হয়েছেন। তৃণমূলী ভেকধারী পুলিশ সমস্ত পুরুষদের ঘরছাড়া করেছে। বহুক্ষেত্রে মহিলারা অতন্দ্র প্রহরায় সদাজাগ্রত। সর্বত্র মহিলারা ব্যাপক লড়াই দিয়েছে। স্বামী খুন হয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে, লাঞ্ছিত নিপীড়িত হয়েছে তবু পুরুষের সঙ্গে একইভাবে মহিলারা রাস্তা জুড়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে 'জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে' লড়েছে এবং এখনও লড়ছে কারণ অত্যাচারীর অত্যাচার এখনও থামেনি। আরো বহুদূর লড়তে হবে। প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এই নিবন্ধে আর একটি কথা বলে শেষ করতে চাই–বামপন্থীরা এই ভোটে জীবনমরণ পণ করে লড়ছে। তাঁদের অজস্র সংগ্রামী অভিনন্দন। কিন্তু এখন সময় এসেছে (১) বিকল্প নীতি নিয়ে খুব সোচ্চারে মানুষের দরজায় পৌঁছতে হবে। (২) মানুষের মনে বিশ্বাস আস্থা ফেরাতে হবে যে বামপন্থীরাই বিকল্প শক্তি। এবার বামপন্থীদের সক্রিয়তার ভিত ছিল দুটো (১) সাহস, (২) আত্মবিশ্বাস। তার ফলে তারা মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে যেমন বেশি, তেমন আসন সংখ্যা, ভোটের শতকরা হিসেবে সব বেড়েছে। স্মরণে রাখতে হবে নির্বাচনী লড়াই বুথেই হবে তাই বুথ সংগঠন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নেতা ও কর্মী। নির্বাচন শুধু ভোটের লড়াই নয়। একটা নির্বাচন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই। একদিকে দুর্নীতি ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই। অন্যদিকে কর্পোরেট স্বার্থবাহী কেন্দ্রের আর এস এস–বিজেপি সরকারের হিন্দুত্ববাদী মতান্ধ, কূপমণ্ডুক ও বিভাজনের বিষয়ময় রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই।

তৃণমূলের মত আর এস এস-বিজেপিও জনসাধারণকে আবারও বিভ্রান্ত করতে চাইছে। ফলে এই দুয়ের বিরুদ্ধে যে লড়াই হবে তা, জনগণের লড়াইয়ের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। পুঁজির পাহারাদার, নয়া উদার অর্থনীতির মদতদাতারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া জোরকদমে চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে চাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষ কথা বলবে মানুষই। জুলুম বন্ধ না হলে জনরোষেই ধ্বংস হবে দুঃশাসনের পালা। এই কুৎসিত তাণ্ডব মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে।

Vol. 70 Issue No. 35 শনিবার, ১৫ জুলাই ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না

রাশিয়া-ইউক্রেনের সংঘর্ষ চলছে পাশাপাশি ন্যাটোও তার আয়তন ও প্রভাব বলয় একতরফা বাড়িয়ে চলেছে। উত্তেজনাও ক্রমশ আরও তীব্র হচ্ছে। ভয়ঙ্কর এক পরিণতির জন্যই অপেক্ষায় রয়েছে দুনিয়ার মানুষ। যুদ্ধ ৫০০ দিন ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে সংঘর্ষে যে ভূ-রাজনৈতিক মন্থন চলছে তার অবসানের কোনও ইঙ্গিত এখনও নেই। একদিকে যুদ্ধ চলছে, জনজীবন বিপর্যস্ত। অপরদিকে ন্যাটোর মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব কমার কোনও লক্ষণ নেই।

এদিকে যুদ্ধের এতগুলি দিন পরেও রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। তবে রাশিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চয়ই কমেছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। পরিস্থিতি বেশ জটিল। সুইডেন ন্যাটোয় যোগ দিতে খুবই আগ্রহী। কিন্তু তুরস্কের বিরোধিতায় তা সম্ভব হচ্ছে না। কোনও রকমে অল্প ভোটের ব্যবধানে এরডোয়ান নির্বাচন জিতলেও, সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে আঙ্কারার অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট লুকাশেঙ্কো জানিয়েছেন, বেলারুশ রাশিয়া থেকে প্রচুর পারমাণবিক অস্ত্র পেয়েছে। রাশিয়া থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র সম্ভারের মধ্যে এমন অনেক পারমাণবিক বোমা আছে যেগুলি হিরোসিমা- নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়েও তিনগুণ বেশি শক্তিশালী। এই বেলারুশ কিন্তু বেশ দৃঢ়ভাবেই রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত বেলারুশকে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের মঞ্চ হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। ন্যাটোর প্রবাদপ্রতিম মন্দ ছেলে (Bad Boy) তুরস্ক সুইডেনের ন্যাটোতে প্রবেশের দরজা রুখে দাঁড়িয়েছে। কারণ সুইডেন সন্ত্রাসবাদী সংস্থা বিশেষত কুর্দ উপজাতিদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে লাগাতার মদত দিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ন্যাটো যতই লম্ফঝম্ফই করুক না কেন, রাশিয়ার সামরিক অভিযান বন্ধ করতে সফল হবে কী? বরং উল্টোটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে এখনও পর্যন্ত ন্যাটো সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ ইউক্রেনকে ঢালাও সরবরাহ করা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর নেতৃত্বে ন্যাটো জোট এখনও মাত্রার মধ্যেই রয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করার দাবি জানালেও, ন্যাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের দাবি স্বীকার করে নি। তবে সংঘর্ষ যদি চলতেই থাকে অথবা যুদ্ধ যদি চলতেই থাকে, যে কোনও মুহূর্তে মহাবিপর্যয় ঘটতে পারে।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেন অভিযানের জন্য ন্যাটোকে দায়ী করে বারবার বলা হয়েছে, ন্যাটো যদি চুক্তি অনুযায়ী তার সীমার বাইরে পা না রাখতো, তাহলে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের প্রয়োজনই ছিল না, রাশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ারও কোনও প্রশ্ন ছিল না। ফিনল্যান্ড ন্যাটো জোটে যোগ দিয়েছে। সুইডেনেরও যোগ দেওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়া আরও বেশি মাত্রায় বেজিং-এর দিকে ঝুঁকবে এবং ন্যাটো জোটের পরিধি আরও বাড়লে নতুন এক ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হতে চলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাটোর ভাবনায় তার পরিধির বাইরে অন্য দেশগুলির সাথে যোগাযোগের বরাত রয়েছে এবং আন্তর্মহাদেশীয় রাজনীতিতে ১৪৫ কোটি মানুষের দেশ ভারতের কথা মাথায় রেখেই ন্যাটো জোট ভারতকে নিজেদের পক্ষে আনার কথা ভাবলেও ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর– রাশিয়া-ইউক্রেনকে এখনও আলাপ আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার জন্যই সওয়াল করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত বনাম চিন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের বৃহৎ উল্লম্ফনের সম্ভাবনা বর্তমানে সংবাদ মাধ্যমে এবং রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোচনার বিষয়। চিনের সঙ্গে ভারতের তুলনায় বিষয়টি প্রায়শই আলোচনায় এসে পড়ে। প্রসঙ্গত, আজকের ভারতের অর্থনীতির আয়তন ২০০৭ সালের অর্থাৎ প্রায় ১৫ বছর আগের চিনের আর্থনীতির আয়তনের সমতুল্য শিল্পপণ্য উৎপাদন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করলে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি চিনের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়।

ভারতের অর্থনীতির আয়তন এই মুহূর্তে ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। এমনই দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যা দেড় দশক আগের চিনের অর্থনীতির আয়তন। ঐ সময় চিনে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৬৯৪ ডলার। আইএমএফ-এর অনুমান ২০২২ সালে ভারতে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২,৩৭৯ ডলার, ২০২৩ সালের এই পরিমাণটা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬০১ ডলারে পৌঁছাতে পারে।

চিনের উল্কাসম অর্থনৈতিক উত্থানের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক বৃদ্ধির অবদান সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা। ২০০৩ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে চিনের বিনিয়োগ বনাম জিডিপি-র অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশ। পাশাপাশি এই সময়কালেই ভারতে বিনিয়োগের অনুপাত ছিল মাত্র ৩৩ শতাংশ এবং এই পার্থক্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

২০১২-২০২১-এর মধ্যে চিনের অর্থনৈতিক উল্লম্ফনের হার আরও বেড়েছে, জিডিপি বনাম বিনিয়োগের অনুপাত ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই হারটা আরও নেমেছে ২৯ শতাংশে। ভারতে এই সময়কালেই বিনিয়োগের হার কমেছে। বাড়েনি।

কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সম্প্রতি সন্তোষজনক হলেও বিগত বছরগুলিতে ঢিমেতালে উন্নয়নের ফলে ভারত কবে মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে তা বলা মুস্কিল।

রপ্তানি বাণিজ্যে, ২০২২-২৩ সালে ভারতের পণ্য রপ্তানি এবং পরিষেবার মোট ৭৭০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আমদানির পরিমাণ ৪৯০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৭ সালে চিনের রপ্তানি আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণের সঙ্গে তুলনীয়। বর্তমানে চিনের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। পরিষেবার বদলে পণ্য রপ্তানির পরিমাণটা অনেক বেশি। আমদানির পরিমাণ ৯৫০ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে চিনের গভীর সম্পর্কটা এক বিশেষ মাত্রায় পৌঁছেছে।

ভারতে পণ্য উৎপাদনের পরিবর্তে নির্মাণ শিল্প এবং পরিষেবার ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের হার বেশি হয়েছে। কিন্তু শিল্প পণ্য উৎপাদনের হারের সন্তোষজনক বৃদ্ধি না ঘটলে সামগ্রিক উন্নয়নের দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব নয় এবং এই উন্নয়নও স্থিতিশীল হতে পারে না। বর্তমান সময়ে ভারতের উন্নয়নের হারের কোনও পরিবর্তন না হলেও ভারত হয়ত এগিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু চিনের বিরাট অর্থনৈতিক উল্লম্ফনের ধারে কাছে পৌঁছানোও ভারতের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

চরম হিংসা ও বিদ্বেষের ব্যাপক প্রসার

১-এর পাতার পর—

ফলাফল ঘোষিত হয়ে যাবার পরেও প্রশাসনের কারসাজিতে পরাজিত তৃণমূলীদের জয়ী ঘোষণা করা হলো, অসংখ্য স্থানে ব্যালট পেপার ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ভোটকেন্দ্রের কাছে কোনও জলাশয় বা নর্দমায়। সেগুলির ছবি দেখে বোঝা স্পষ্ট বোঝা সম্ভব যে, সবই বামপন্থী বিজেতাদের। এই সমস্ত প্রার্থীদের পরাজিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এক জঘন্য স্বৈরশাসিকার গণতন্ত্র হত্যার স্বরূপ উন্মোচিত। আর কিছু বাকি নেই।

এবারের পঞ্চায়েত ভোটে মমতা ব্যানার্জীর গভীর ষড়যন্ত্র বানচাল করে গ্রামে গ্রামে মানুষের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় বামপন্থীরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে সব জায়গায় সম্ভব হয়েছে মানুষ প্রতিরোধের দৃঢ় ব্যারিকেড তৈরী করেছেন। বহু মানুষের করুণ মৃত্যু ঘটেছে পুলিশের সরাসরি আক্রমণে। আবার তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা পুলিশের পোশাকেও প্রতিবাদী মানুষদের বিরুদ্ধে অকাতরে গুলি ও বোমা ব্যবহার করেছে। নির্বাচনের পর প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও মানুষের মৃত্যু মিছিল চলছেই। বহু বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন মানুষ শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁদের দৃপ্ত ও সাহসী ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেই এমন নৈরাজ্য ও হিংসাশ্রয়ী অরাজকতার অবসান ঘটাতে পারবে বলে প্রত্যয়। গ্রামে গ্রামান্তরে ভোটের ফলাফল এখন কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। এমন নির্বাচনকে সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুনভাবে ভোট গ্রহণ ও গণনার দাবিতে বামপন্থীরা সোচ্চার।

এই ভোটে হিংসা ও বিদ্বেষের যে হলাহল মমতা ব্যানার্জী ছড়িয়েছেন তা, তাঁকেই গ্রাস করবে। মানুষের অকাতর প্রাণনাশ ব্যর্থ হতে পারে না। কৌতুককর বিষয়, কলকাতার রাজভবনের কর্তা হাঁকডাক সর্বস্বতার মধ্যেই আবদ্ধ রইলেন। তাঁর সঙ্গেও সম্ভবত রাজ্য প্রশাসন ও মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশনের গভীর গোপন বোঝাপড়া ছিল বলেই অনেকে মনে করেন।

কম. অশোক কর্মকার প্রয়াত

৯ জুলাই দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দলের দীর্ঘ দিনের কর্মী, সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভা বীরভূম জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং আরএসপি বোলপুর জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য এবং আরএসপি বোলপুর ১-নং লোকাল কমিটির অন্যতম নেতা কম. অশোক কর্মকার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। কম. কর্মকার-এর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে আরএসপি বীরভূম জেলা কমিটি। কম. কর্মকার-এর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর বাড়িতে যান দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. রঞ্জিৎ মজুমদার, জেলা কমিটির অন্যতম নেতা কম. দেবেন্দ্র নাথ বাগদী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সহ সমর্থকবৃন্দ। তাঁরা কম. কর্মকারের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সহমর্মিতা জানান।

কম. অশোক কর্মকার লাল সেলাম।
কম. অশোক কর্মকার অমর রহে।

■ ■ ■

কম. অরবিন্দ সাধু প্রয়াত

গত ২৮ জুন বীরভূম জেলার ইউ টি ইউ সি-র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং আরএসপি বীরভূম জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কম. অরবিন্দ সাধু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। প্রয়াত কম. সাধুর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে আরএসপি বীরভূম জেলা কমিটি। কম. সাধুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র দলের জেলা সম্পাদক কম. স্বপন কুমার রায় সহ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর ও জেলা কমিটির সদস্যরা বাড়িতে যান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, পরিজনদের সাথে কথা বলেন।

কম. অরবিন্দ সাধু লাল সেলাম।
কম. অরবিন্দ সাধু অমর রহে॥

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-